মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এবং হুমায়ুনের আমলে রাজনৈতিক অস্থিরতা সুকুমার কলাচর্চার পক্ষে সহায়ক ছিল না। বাবরের আত্মজীবনী থেকে বোঝা যায় যে, স্থাপত্য সৃষ্টিতে তাঁর উদ্যোগের অভাব ছিল না, যদিও সেগুলির প্রায় কিছুই টিকে নেই। কিন্তু অধ্যাপক *সরস্বতী* মনে করেন, বাস্তব সত্য হল এই যে, ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্য ও শিল্পীদের দক্ষতা সম্পর্কে তাঁর যে উন্নাসিকতা ছিল, তা থেকে কোনো মহৎ শিল্প সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। হুমায়ুনের পারসিক শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং শিল্পবোধের অভাব না থাকলেও কোনো স্থায়ী কীর্তি তিনি রেখে যেতে পারেননি। শাসনের সূচনা পর্বে হুমায়ুন দিল্লীতে *দিনপনাহ্'* নামক এক নতুন নগরী নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন যার অর্থ, *জগতের আশ্রয়'*। এই নগরীর প্রাথমিক নির্মাণ কার্য শুরু হলেও তা সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। কিন্তু *পার্সি ব্রাউন* মনে করেন, বাবর এবং হুমায়ুন পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের শিল্প স্থাপত্যকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন।

মুঘলদের ধারাবাহিকতায় সাময়িক ছেদ এনেছিলেন *শেরশাহ্*। অধ্যাপক *সরস্বতী* এবং *পার্সি ব্রাউন* মনে করেন, তিনি ছিলেন তুর্কো-আফগান যুগ ও মুঘল যুগের স্থাপত্য ভাবনা ও কর্মের মধ্যবর্তী যোগসূত্র। তাঁর সৃজনশীল স্থাপত্য প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায় দিল্লী, সাসারাম এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে। সিংহাসন আরোহনের পরেই তিনি দিল্লীতে ইন্দ্রপ্রস্থের পাশে *'পুরোনো কেল্লা'* গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। কেল্লার ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা হয় যে, এটি ছিল একটি বৃহৎ পরিকল্পনা। এই দুর্গের মধ্যে রয়েছে *কিলা-ই-কোহনা'* মসজিদ। গঠন পরিকল্পনা ও অলংকরণের পরিপ্রেক্ষিতে *পার্সি ব্রাউন* একে বলেছেন, *'...a gem of architectural design'*। সৌন্দর্য্যময়তা ছাড়াও এই মসজিদ এক ঐতিহাসিক গতির সাক্ষী। মূল বারন্দার দুদিকে পিলারগুলির মধ্যে যেমন কুতুবমিনারের ছায়া লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ওপরের ধনুকাকৃতি খিলানগুলির কিছুটা মুঘল শাসকদের দ্বারা অনুসৃত *টিউডর* ধারার আভাস দেয়। সাসারামে নির্মিত শেরশাহের বিভিন্ন স্থাপত্য কর্মের মধ্যে সবচেয়ে সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যে ভরা সৌধ হল তাঁর সমাধি মন্দির। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতেই কল্পনার বলিষ্ঠতা এবং প্রয়োগের বৈচিত্র্যে ভরা এই সৌধ অনন্যতার অধিকারী।

সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহনের ফলে যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে এবং মুঘল রাজ ঐতিহ্যের নতুন সূচনা ঘটে, তেমনি শিল্প স্থাপত্যের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। *আবুল ফজল* লিখেছেন, সুনির্মাতা হিসেবে আকবরের ছিল সহজাত প্রতিভা। ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক অনুরাগ। তাই তাঁর আমলে নির্মিত বিভিন্ন সৌধ ও স্মৃতি স্তম্ভে ইন্দো-পারসিক ধারার সমন্বয় ঘটলেও বিদেশী শিল্পাদর্শ কখোনোই ভারতীয় শিল্পধারাকে অতিক্রম করতে পারেনি। আকবরের রাজত্বের অষ্টম বছরে হুমায়ুনের বিধবা পত্নী হাজী বেগমের উদ্যানে হুমায়ুনের স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ শুরু হয়। শেষ হতে লাগে আরো প্রায় আট বছর। হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর এক সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে এই সৌধের মধ্যে। হুমায়ুনের সমাধিতে দিগম্বুজের নির্মাণ কারিগরী ও প্রায়োগিক দিক থেকে প্রথম সম্পূর্ণতা পেয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা। এই সৌধে পারসিক শিল্পীদের প্রাধান্য পাওয়া খুব অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। অবশ্য এই সৌধে সাদা মার্বেলের যথেচ্ছ ব্যবহার, যা পারসিকদের অজানা ছিল এবং বিভিন্ন রঙিন টালির অনুপস্থিতি প্রমাণ করে এই সৌধে ভারতীয় শিল্পধারা নানাক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছিল। ব্রাউনের মতে, এই সৌধে পারসিক শৈলীর ভারতীয়করণ ঘটেছিল।

1565 খ্রীষ্টাব্দে আকবর যমুনা নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর আগ্রা দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এই বিশাল পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে প্রায় আট বছর। এর পশ্চিম প্রান্তে নির্মিত হয়েছে দিল্লী গেট। প্রবেশ পথের নির্মাণে শিল্পী নব উদ্দীপনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীন ও মুক্ত মনে তাঁর কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। এই অলংকৃত ও সুনির্মিত বিশাল প্রবেশদ্বার মহান ও মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে সমস্ত কলারসিকের। আবুল ফজলের বিবরণ থেকে অনুমিত হয়, আকবর বাংলা ও গুজরাটের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। *ব্রাউন* লিখেছেন, সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই দুর্গের পরিকল্পনার ওপর গোয়ালিওরের *তোমার রাজপুত* দলপতি মানসিংহের দুর্গনগরী এবং দিল্লী গেটের ওপর অমর সিং নির্মিত প্রবেশ দ্বারের দারুণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক *সরস্বতী*-র মতে, আগ্রা দুর্গের পরিকল্পনা ও নির্মাণে মুঘলদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে স্থানীয় বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

আকবরের স্থাপত্য প্রতিভার সর্বোত্তম ও মহোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে *ফতেপুর সিক্রি*-র সৌধরাজিতে। আগ্রা শহরের প্রায় ছাব্বিশ মাইল পশ্চিমে নির্মিত এই নগরীতে সম্রাটের সমন্বয়ি কল্পনা পেয়েছে বাস্তব রূপ। *স্টেনলি লেনপুল* লিখেছেন, ভারতবর্ষের কোথাও এমন স্থান নেই, যা এই পরিত্যক্ত শহরের চেয়ে সুন্দর অথচ যা এর চেয়ে বেশী বেদনা মনে উদ্রেক করতে পারে। এখানকার

সৌধগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা — *ধর্মীয় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ*। ধর্মীয় সৌধগুলির নির্মাণশৈলীতেও ইসলামিক ধর্মাদর্শের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কিন্তু অন্যান্য সৌধগুলির গঠন পরিকল্পনা বা অলংকরণে সম্রাটের উদারতা, সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ি আদর্শের প্রভাব স্পষ্ট। প্রথম ধরণের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে *জামি মসজিদ*-এর নাম স্মরণীয়, যাকে *ফার্গুসান* ফতেপুর সিক্রির গৌরব এবং সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে অতুলনীয় বলেছেন। জামি মসজিদের দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথে আকবর নির্মাণ করেন *বুলন্দ দরওয়াজা*। মার্বেল এবং রক্তাভ বেলে পাথরের নির্মিত এই প্রবেশদ্বার এই মসজিদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিছুটা ম্লান করলেও এই সুবৃহৎ প্রবেশদ্বারের মাধ্যমেও হিন্দুস্থানের *বাদশাহ*-র শক্তি, সাহস আর দম্ভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই মসজিদের কাছেই নির্মিত হয়েছিল *শেখ সেলিম চিস্তি*-র সমাধি ভবন।

মায়ানগরী *ফতেপুর সিক্রি*-তে ধর্মনিরপেক্ষ সৌধের মধ্যে স্মরণীয় কয়েকটি সৃষ্টি হল *দেওয়ান-ই-খাস', যোধাবাঈ মহল', বীরবলের গৃহ', মরিয়মের গৃহ', তুর্কী-সুলতানার আবাস', পঞ্চমহল'* প্রভৃতি। *দেওয়ান-ই-খাস* বা *জনতার দরবার* আকারে বৃহৎ না হলেও এর গঠন কল্পনা ছিল অভিনব। মূল দরবারের চতুর্দিকে প্রসারিত ঝুলন্ত বারান্দা এবং কেন্দ্রস্থলে রাজকীয় আসনের জন্য নির্মিত ঝুলন্ত মঞ্চ আকবরের মৌলিক ও অভিনব কল্পনাশক্তির ফলশ্রুতি। *বীরবলের গৃহ*-টি মুঘল আমলে নির্মিত আবাস গৃহের মধ্যে একটি অন্যতম সুন্দর ও শৌখিন প্রাসাদ হিসেবে স্বীকৃত। অধ্যাপক সরস্বতীর মতে, এই আবাস গৃহের ধারণা ও রূপায়নের মধ্যে কেউ কেউ পারসিক শিল্পীর কর্তৃত্ব কল্পনা করতে পারেন। কিন্তু এর গঠন পরিকল্পনা যে পুরোপুরি ভারতীয় এ কথা অনস্বীকার্য। *ভিনসেন্ট স্মিথ* ফতেপুর সিক্রি-কে *'...a romance in stone'*-রূপে বর্ণনা করেছেন।

আকবরের আমলের বুদ্ধিদীপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন শিল্পসাধনা তাঁর পুত্রের আমলে সাময়িক বিরতির সম্মুখীন হয়েছিল। *জাহাঙ্গীর* তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে আকবর কর্তৃক সূচিত নিজ সমাধি সৌধের অসমপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নেন। সেকেন্দ্রাতে নির্মিত এই সৌধের কাজ আকবরের মৃত্যুর আট বছর পর 1613 খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। মনে হয়, এটি যেন মূল রূপকারের কল্পনাকে যথার্থভাবে প্রস্ফুটিত করতে পারেনি। দ্বিতলের কাজে সামঞ্জস্য বা শিল্পবোধ নেই, যা আকবরের অন্যান্য শিল্পের মধ্যে লক্ষ্যণীয়। জাহাঙ্গীরের তুলনায় তাঁর পত্নী নুর জাহানের স্থাপত্য প্রীতি ছিল বেশী। নুরজাহানের উদ্যোগে নির্মিত পিতা ইতিমদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধ মুঘল শিল্পকলার ইতিহাসে একটি কৃতিত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত, যা চিরাচরিত রক্তাভ বেলেপাথরের পরিবর্তে আগাগোড়া মার্বেল পাথরে নির্মিত করে এক নবযুগের সূচনা করেছে। পরবর্তীকালে শাহজাহানের আমলে এই ধারার চরম বিকাশ ঘটে। আভ্যন্তরীণ অলংকরণের কাজে রঙিন মোজাইক টালির ব্যবহার, যা *পিয়েত্রা দুরা* রীতি নামে পরিচিত, একে অন্যন্যতা দিয়েছে।

শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল স্থাপত্যকর্মের *স্বর্ণযুগ'* বলা হয়। তবে আকবর সমন্বয় ও ভারতীয়করণের চিন্তাধারাকে স্থাপত্যে প্রতিফলিত করতে চাইলেও জাহাঙ্গীরের-আমলে ও পরবর্তীকালে বিদেশী স্থাপত্যকলার আড়ম্বর ও অতি অলংকরণের প্রতি আকর্ষণ মুঘল স্থাপত্যকর্মকে স্বদেশীয় শিল্পাদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। শাহজাহানের ছড়িয়ে থাকা স্থাপত্যকর্মগুলির মধ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, *দেওয়ান-ই-আম', মতি মসজিদ', জামি মসজিদ', শিসমহল'* এবং বিশ্ববন্দিত *তাজমহল'*। আগ্রা দুর্গে *খাসমহল', শিসমহল', আঙ্গুরি বাগ', মতি মসজিদ'* প্রভৃতি সৌধ তাঁর রাজত্বের প্রথম পর্বের স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। 1638 খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে *শাহজাহানাবাদ'* নামাঙ্কিত নতুন রাজধানী নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ফার্গুসনের মতে, এই তা কেবল প্রাচ্যে নয়, সম্ভবত সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক সুরম্য, অলংকৃত এবং বিস্ময়োদ্দীপক একটি সৃষ্টি। *স্টিফেন পি. ব্লেক* তাঁর *"Shahjahanabad : The Sovereign City in Mughal India"* গ্রন্থে এই শহরে পিতৃতান্ত্রিক অভিজাততন্ত্রের ধারণাটিকে প্রতিফলিত হতে দেখেছেন।

এখানেই রয়েছে সুপ্রসিদ্ধ *লালকেল্লা'*, যার বিশালতা ও উচ্চতা কেবল মুঘল স্বৈরতন্ত্রের নয়, বর্তমানের ভারতবর্ষের দৃপ্ত গৌরবের স্মারক হিসেবে আজও তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এর মধ্যে অবস্থিত *দেওয়ান-ই-আম'*-এর গম্বুজ এমন পরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয়েছে যে, কক্ষের যে কোনো স্থান থেকে সিংহাসনে আসীন বাদশা-কে ভালভাবে দেখা যাবে এবং একই রকমভাবে তাঁর বক্তব্য শোনা যাবে। এই বিখ্যাত সভাগৃহের মধ্যেই সংস্থাপিত ছিল শাহজাহানের শিল্পপ্রীতির আরেকটি বিখ্যাত নিদর্শন এবং মহার্ঘ সৃষ্টি *ময়ূর সিংহাসন*। *বেবাদল খাঁ* নির্মিত এই সুদৃশ্য সিংহাসন মণি-মাণিক্যে আর রত্নে ভরা। *দেওয়ান-ই-খাস'* তার গঠনগত সৌষ্ঠব আর মহার্ঘ অলংকরণের জন্য বিখ্যাত। সম্রাট শাহজাহান এখানে খোদাই করে রেখেছেন, *'দুনিয়ার বুকে যদি স্বর্গ কোথাও তাকে, তবে তা এখানে, তা এখানে, কেবলই এখানেই"*। এই সুদৃশ্য সৌধের সাথে পাল্লা দিয়েই নির্মিত হয়েছে *রঙ্গমহল'* বা *ইমতিয়াজমহল'*। *জামি মসজিদ'*-এর নির্মাণকাল 1644-1658 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। দিল্লীর জামি মসজিদের প্রায় সমসাময়িক কালে শাহজাহান আগ্রা দুর্গের বাইরেও একটি *জামি মসজিদ'* নির্মাণ করেন। অধ্যাপক *সরস্বতী* দুই জামি মসজিদের তুলনা করে লিখেছেন, আগ্রার জামি মসজিদে ছিল আবেগপ্রবণতা, কিন্তু দিল্লীর জামি মসজিদে ছিল কাঠিন্য আর ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ।

Scanned with CamScanner

প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ বেগমের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য নির্মিত হয়েছিল *তাজমহল*। 1630 খ্রীষ্টাব্দে মমতাজের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সম্রাট যমুনার তীরে কালজয়ী এই সৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন, টেভার্নিয়রের মতে, যা নির্মিত হয়েছিল বাইশ বছরে। পশ্চিমী শিল্পরীতির তুলনায় এই সৌধে ইন্দো-পারসিক শিল্পধারার ক্রম পরিণতি স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। *আবদুল হামিদ লাহোরী বাদশানামা* গ্রন্থে লিখেছেন, দেশের নানা প্রান্তের সর্বোত্তম দক্ষ শিল্পী এবং তাদের সহযোগীরা প্রত্যেকেই তাদের সর্বটুকু দক্ষতা নিঙড়ে দিয়েছেন *তাজমহল*-কে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য। *হ্যাভেল*ও মনে করেন, তাজমহলের অবয়বে ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর অনুপস্থিতি ও ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য রীতির বহিঃপ্রকাশ খুবই স্পষ্ট। অধ্যাপক *সরস্বতী* লিখেছেন, যুগ যুগ ধরে *তাজমহল*-কে বাদশার অমর প্রেম আর দুঃখের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কল্পনা ও বিচার করা হয়েছে, এর শিল্পগুণ ও স্থাপত্য কর্মের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়নি। *হাক্সলে* এখানে লক্ষ্য করেছেন *কল্পনার দৈন্য*। এঁরা মনে করেন, স্থাপত্য শৈলীর প্রযুক্তিগত দিকের বিচারে তাজমহল অনন্য কোনো সৃষ্টি ছিল না, অবশ্য এর আপাত সৌন্দর্য্য নিঃসন্দেহে তুলনাহীন।

কঠোরভাবে ধর্মবিশ্বাসী ঔরঙ্গজেবের বিচারে, ব্যয়বহুল এবং অলংকৃত স্থাপত্যকর্ম ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয়। তথাপি তাঁর আমলে গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ হল মতি মসজিদ, যা সম্রাট নিজের ধর্ম কর্মের জন্য দিল্লী দুর্গের মধ্যেই নির্মাণ করেছিলেন। নামে মিল থাকলেও আগ্রার মসজিদের সাথে এর গঠন পরিকল্পনা, অবয়ব, অলংকরণ প্রভৃতিতে অমিল ছিল প্রচুর। দ্বিতীয়টি হল, লাহোরে নির্মিত বাদশাহী মসজিদ, যার মূল আকর্ষণ তার ছাদের ওপর নির্মিত অষ্ট মিনারের অধিকাংশই ভেঙে গেছে। ঔরঙ্গাবাদে নির্মিত তার পত্নী *রাবেয়া-উদ-দুরানী*-র স্মৃতি সৌধে তাজমহলকে নকল করার ব্যর্থ চেষ্টা সৌধটিকে হাস্যাস্পদ করে তোলে।

মুঘলদের স্থাপত্যশিল্পে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যার দ্বারা মনে হতে পারে, এটি বিশেষ স্বতন্ত্র শিল্পধারা। তাঁরা বাগদাদ পারস্যের শাসন, শিল্প-স্থাপত্য সম্বন্ধে পূর্ণ এক ধারণা ও ঐতিহ্য গজনী, আফগানিস্তান হয়ে ভারতের সমতলভূমিতে বহন করে এনেছিলেন। বাগদাদ-পারস্যের সংস্কৃতি ছিল উৎকর্ষের চরম শিখরে। মুঘলরা ভারতীয় ও তুর্কীদের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক নতুন শিল্পধারার সঙ্গে পারস্য রীতির সংমিশ্রণে এক অভূতপূর্ব যে নতুন শিল্প সুষমামণ্ডিত শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন, তাকে সহজেই *মুঘল শিল্প* বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু মুঘল স্থাপত্যশিল্পে কতটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, কিংবা এই স্থাপত্য শিল্পে বিদেশী প্রভাব কতখানি ছিল, সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। *"Cambridge History of India (Vol. III)"* গ্রন্থে বলা হয়েছে, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শক্তিশালী ও উন্নত, অথচ সম্পূর্ণ পৃথক সভ্যতার প্রভাবে অতি অপূর্ব এক বিশেষ স্থাপত্যশিল্প গড়ে ওঠে, যা যুগ-যুগান্তর ধরে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দর্শক ও পর্যটকদের বিস্ময় উৎপাদন করে আসছে। প্রখ্যাত শিল্প বিশেষজ্ঞ *ফার্গুসন* মনে করেন, মুঘল স্থাপত্য নিদর্শনে গম্বুজ-এর ব্যবহার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবহার হিন্দু শিল্পধারার রীতি নয়।

কিন্তু *ফার্গুসন, এডওয়ার্ডস* ও *গ্যারেট*-এর মতের সঙ্গে একমত না হয়ে *হ্যাভেল* প্রতিবাদ করে বলেছেন, ভারতবর্ষ চিরকাল সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত। সুতরাং যদি কিছু পারসিক প্রভাব পড়ে থাকে, তাহলে তাতে শিল্পধারার মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং এই সংমিশ্রণের ফলেই মুঘল স্থাপত্যশিল্প কালজয়ী হয়েছিল। তাঁর মতে, মুঘল স্থাপত্যর মূল শিকড় ভারতীয় রীতির মধ্যেই গ্রথিত ছিল। *স্যার জন মার্শাল* বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মুসলমানী স্থাপত্যরীতি হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির দানেই পরিপুষ্ট হয়েছে। কার কাছে কে কতটা ঋণী, তা বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে আবার স্থানীয় বিশেষ রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থাপত্য এক-একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। তাই *হিতেশ রঞ্জন সান্যাল* বঙ্গদেশের শিল্পরীতি বিচার করতে গিয়ে বলেছেন, পশ্চিম এশিয় স্থাপত্যের উপকরণ বাংলা আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যের ওপর লক্ষ্যণীয়। এরই ফলে বাংলার মসজিদগুলি হয়ে উঠেছিল বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যরূপ এবং পশ্চিম এশিয় স্থাপত্য কৌশল ও উপকরণের সমন্বয় ক্ষেত্র। *ঈশ্বরীপ্রসাদ* এই সব দিক পর্যালোচনা করে বলেছেন, মুঘল রীতি বলে কোনো রীতি ছিল না। মুঘলরা কোনো বিশেষ শিল্পরীতির প্রবর্তন করেননি। ভারতে যা ছিল তাকেই পরিশীলিত করেন মাত্র। ঐতিহাসিকদের মধ্যে মুঘল স্থাপত্যরীতি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মুঘলরা বহিরাগত জাতি হিসেবে বাগদাদ পারস্যের স্থাপত্য রীতির ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্যরীতির এক অভূতপূর্ব সমন্বয় অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়ে ফেলেন এবং তার সঙ্গে ধর্ম, ব্যক্তিগত রুচি ও স্থানীয় ভাবধারা প্রভৃতির প্রভাবের ফলে এই যুগে এক অভূতপূর্ব কালজয়ী স্থাপত্যরীতির উদ্ভব ঘটেছিল বলে *"Cambridge History of India (Vol. III)"* গ্রন্থে বলা হয়েছে।

Scanned with CamScanner